বর্তমান পরিস্থিতি ও করণীয়

বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি কোন পথে?

১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতাত্তোর ৪৬ বছরের স্বৈরশাসন, অপশাসন ও দুঃশাসনের পরিণতিতে এক চরম সংকটময় পরিস্থিতির মুখে পড়েছে। ক্ষমতার পালা বদলকারীদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দুই রাষ্ট্রপতি হত্যা, জেল হত্যা, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী হত্যা, সৈনিক হত্যা, সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতায় টেনে আনা, ক্ষমতার মারমুখী খেলা সামলাতে রেফারি হিসাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আনা এবং তাকে অকার্যকর ও বাতিল করা, ভোটকে ভেল্কির জায়গায় নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি সব অপকর্ম সম্পন্ন করে এখন তাদের ক্ষমতা ছাড়া বা ক্ষমতার বাইরে থাকা দুটোকেই ঝুঁকিপূর্ণ ও দুঃসাধ্য করে তুলেছে। ধাপে ধাপে তাদের এখানে আসতে হয়েছে, কারণ শাসকশ্রেণির নীতি-আদর্শ বর্জিত ক্ষমতা কেন্দ্রীক লুটপাটের রাজনীতি রাতারাতি বিত্তবৈভবের মালিক বনে যাওয়ার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। দলীয়করণের বিষাক্ত ছোবলে সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন ও বাহিনীসমূহকে ক্ষমতার মালিক জনগণের বদলে ক্ষমতায় চেপে বসা শাসক দলের স্বার্থ ও ইচ্ছা পূরণের সংস্থায় পরিণত করা হয়েছে। এখন উন্নয়নের ঢাক বাদ্য বাজিয়ে দুর্নীতির মচ্ছব চলছে। রাস্তা, ব্রিজ, ফ্লাইওভার ইত্যাদি নির্মাণে ভারত, চীন ও ইউরোপের দেশে দেশে যে খরচ হয় তার চেয়েও দ্বিগুণ থেকে পাঁচগুণ বেশি খরচ দেখিয়ে একদল লোক রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ বনে যাচ্ছে। রাস্তা-ঘাট, ইট-পাথর, সেতু-সৌধ যত মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে; তত মানবতা-মনুষ্যত্ব, সম্প্রীতি-সৌহার্দ মাথা নামিয়ে ভেঙ্গে পড়ছে, খান খান হয়ে যাচ্ছে। দুর্নীতি নীতিকে বিতাড়িত ও উপহাসের বিষয়ে পরিণত করে চলেছে। এদের আয়-উন্নতি এতটাই বিপুল যে, তা দেশের সীমানায় রাখা যাচ্ছেনা। ফলে মালয়েশিয়ায় দ্বিতীয় বাড়ি, কানাডায় বেগম পাড়া, বছরে ৭২ হাজার কোটি টাকা পাচার, ১০ বছরে সাড়ে ৬ লক্ষ কোটি টাকা পাচার ইত্যাদি তথ্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশীয় হিসাব নিকাষ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকসমূহকে ঋণের নামে লুট করে উজাড় করে দিচ্ছে সরকার ঘনিষ্ঠরা আর জনগণের পকেট কেটে ব্যাংকের খালি বাক্স পূরণ করা হচ্ছে। শেয়ার বাজার থেকে শুরু করে 'কুইক রেন্টালে কুইক মানি' দীর্ঘ মেয়াদে পকেটস্থ করাসহ নানা সংস্থার অর্থ কেলেঙ্কারির কূলকিনারা যেমন নাই, তেমনি সরকারের পক্ষ থেকেও এর রহস্য উদ্ঘাটন কিংবা ব্যবস্থা গ্রহণের বাস্তব কোন উদ্যোগ নাই। কিছু ক্ষেত্রে বরং ইনডেমনিটি (দায়মুক্তি) দেয়া আছে। এসব বড় রহস্য ঢাকতে দুর্নীতির শরীরের নখ কাটা, চুল ছাঁটার মতো ব্যবস্থাপত্র দেখিয়ে শাসকগোষ্ঠী দুর্নীতি বিরোধী মহড়া প্রদর্শন করে চলেছেন।

বিনামূল্যে বই বিতরণ সাফল্য দেখিয়ে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে মূল্যহীন ও দিক দিশাহীন করে ফেলা হয়েছে। ভোটের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে আঁতাতের ছোঁয়ায় শিক্ষায় সাম্প্রদায়িক প্রলেপ দেয়া হয়েছে। সংবিধানে বর্ণিত একমুখী শিক্ষার বদলে তিন মুখী আবার তিন মুখীতেও বহুমুখী শাখা প্রশাখা বিস্তার করে জাতীয় ভাবমানসকে খণ্ড-বিখণ্ড করাসহ আধুনিক জগত এবং জীবনের সাথে দূরত্ব বাড়ানো হয়েছে। স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ব্যবস্থাকে দামি পণ্যের বিপণী বিতান করা হয়েছে। চিকিৎসা খাতে বছরে ১৫ হাজার কোটি টাকা বিদেশে — অধিকাংশ ভারতে চলে যায় বলে খবরে প্রকাশ পায়। তেল-গ্যাস উৎপাদন ও উত্তোলনকারী জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স-পেট্রোবাংলাকে অকার্যকর করে রাখা হয়েছে। সুন্দরবন ধ্বংসের পরোয়া না করে রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্র করা হচ্ছে। নিরাপত্তা ঝুঁকি সত্ত্বেও ব্যয়বহুল পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র করা হচ্ছে রূপপুরে। সবই করা হচ্ছে দেশের জনমত ও বিশেষজ্ঞদের মতামত উপেক্ষা করে।

নারী-শিশুদের নিরাপত্তাহীনতা ও নির্যাতন চিত্র যে কত ভয়াবহ এবং হৃদয় বিদারক তা প্রতিদিনের গণমাধ্যমের দিকে তাকালেই বুঝা যায়। যদিও এটা নির্যাতন, নিরাপত্তাহীনতার পূর্ণ চিত্র নয়। শ্রমিকশ্রেণি ও কৃষক সমাজ আর্থিক বৈষম্যের চরম শিকার। এদের ন্যায্য মজুরি ও ফসলের ন্যায্য মূল্যের কোন নিশ্চয়তা নেই, সাংবিধানিক অঙ্গীকারেরও কোন প্রতিফলন তাদের জীবনে, কর্ম পরিবেশে নেই। অথচ দেশের উন্নয়ন, উন্নতি প্রধান : তিনটি খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমত : দেশের প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক, বিশেষ করে গার্মেন্টস শ্রমিক। দ্বিতীয়ত : কৃষক, যারা দ্বিগুণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে খাদ্য উৎপাদন সাড়ে তিনগুণ বাড়িয়েছে। তৃতীয়ত : প্রবাসী শ্রমিক যারা সব হারিয়ে ভিনদেশী কারাগারে ঢুকে, সাগরে ভেসে, বিদেশী জঙ্গলের গণকবরে শুয়ে আর ৪৮/৫০ ডিগ্রি রৌদ্র তাপে নির্মাণ কাজসহ শক্তি নিঃশেষ করা সকল কাজ করে। এরাই রক্ত-ঘামে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার যোগান দেয়, বিদেশ থেকে টাকা দেশে আনে, ১৬ কোটি মানুষের মুখের গ্রাস যোগায় আর শাসক শ্রেণির আশীর্বাদপুষ্টরা মানুষের মুখের গ্রাস দুর্মূল্য করে ও বিদেশে টাকা পাচার করে। এদের মুখে উন্নয়নের গুণকীর্তন শুনতে শুনতে মানুষ ক্লান্ত। অথচ অর্জন কার — আর বড়াই কার!

হাওর, পাহাড়, নদী-খাল, খাসজমি, সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ভিটেমাটি সবকিছুতেই দখলদারিত্ব ও সন্ত্রাস চলছে। গুম, খুন, বিচার বহির্ভূত হত্যা, গ্রেফতার বাণিজ্য, নিয়োগ বাণিজ্য, প্রকল্পে হরিলুট, মামলা সন্ত্রাস ও বিচারাধীন মামলা জট, মুক্তিযুদ্ধের গৌরব-মর্যাদা ও চেতনা নস্যাৎ করে মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক ব্যবহার এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ নস্যাৎ করে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, লুটেরা বিত্তবানদের বিলাসী ভোগবাদী জৌলুষের উন্মাদনায় যুব সমাজের অধঃপতন দশা, মাদকাসক্তি ও অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি সবকিছু মিলে এক অসহনীয় বিধ্বংসী পরিস্থিতির মাঝে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে ১৬ কোটি জনগণ।

আন্তর্জাতিক নদীর ভারত হয়ে আসা ৫৪, মিয়ানমার থেকে আসা ৩টি নদী, মোট ৫৭টি নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আমরা আজও পাইনি। বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান কমছে। চাল, ডাল, তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিসের দাম বাড়ছে। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ বিশেষ করে পরোক্ষ করের বোঝা বাড়ছে। যার ওজন সাধারণ জনগণকেই বইতে হচ্ছে। মানুষ এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চায়। এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী আওয়ামী লীগ-বিএনপি কেন্দ্রীক দ্বি-দলীয় দুর্বৃত্তায়িত-দুর্নীতিগ্রস্থ অসুস্থ রাজনীতি। ফলে এদের হাতে দেশ-জাতি-জনগণ ও জাতীয় সম্পদ নিরাপদ নয়।

রাজনৈতিক সংকটের সমাধান একমাত্র রাজনীতির মাধ্যমেই সম্ভব। সঙ্গত কারণেই মানুষ দ্বি-দলীয় বৃত্তের বাইরে বিকল্প একটি রাজনৈতিক শক্তি দেখতে চায়। আমরাও মনে করি দুই জোটের বাইরে বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি মিলে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলা ছাড়া এ অবস্থা উত্তরণে বা অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি এড়ানোর অন্য কোন বিকল্প নেই।

কেমন হবে বিকল্প শক্তি?

বিকল্প বলতে : (ক) এক লুটেরা, দুর্নীতিগ্রস্ত, স্বৈরতন্ত্রের বিপরীতে আরেক লুটেরা, দুর্নীতিগ্রস্ত, স্বৈরতন্ত্র নয় (খ) জনগণের ভোটের অধিকার হরণ করে ভোটার বিহীন নির্বাচন নয় (গ) আর্থিক সমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজের বদলে লুটতরাজ ও শোষণের মাধ্যমে ধন বৈষম্য বৃদ্ধি নয়। (ঘ) অসুস্থ বিকারগ্রস্ত রাজনীতির প্রয়োজনে ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করা কিংবা সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে আঁতাত করে রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িকীকরণ নয়। (ঙ) আমাদের জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে বিদেশি কোন কায়েমী স্বার্থের কাছে জাতীয় সম্পদ বা নিরাপত্তা হুমকির মুখে ফেলা নয়। **যে ন্যূনতম দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল দল, ব্যক্তি ও শক্তিসমূহ এক কাতারে দাঁড়াতে পারে :-**

১. মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনার আলোকে রাজনীতিকে নীতি-আদর্শের উপর দাঁড় করা হবে। অর্থাৎ দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির মাধ্যমে দুর্বৃত্তদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দেওয়ার স্থলে সৎ, আদর্শবান, নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছে রাজনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ফিরিয়ে আনা হবে।

২. কালোটাকা, পেশি শক্তি, দলীয়করণকৃত প্রশাসন, আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি মুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ রচনা করা এবং সুস্থ রাজনৈতিক বিতর্ক ও উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের বিবেক ও মতামতের প্রতিফলন ঘটানোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি চালু করা হবে।

৩. সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী ও ৭০ অনুচ্ছেদসহ গণতান্ত্রিক শাসনের অনুপযোগী সকল আইন, বিধি বিধান বাতিল করে সুষ্ঠু গণতন্ত্র চর্চার পরিপূরক রাজনৈতিক প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করা হবে। বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। গুম, খুন, বিচার বহির্ভুত হত্যা বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হবে। ইতিপূর্বে সংগঠিত গুম-খুন, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিচার করা হবে।

৪. অর্থ ব্যবস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও দুর্নীতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। দেশ থেকে পাচার হওয়া টাকা ফেরৎ আনার যথাযথ উদ্যোগ নেয়া হবে। ব্যাংক, শেয়ার মার্কেটসহ লুটপাটের টাকা ও কালো টাকা, খেলাপি ঋণ উদ্ধারে প্রয়োজনমত দায়ীদের সম্পদ বাজেয়াপ্তসহ যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫. পে কমিশনের পাশাপাশি মজুরি কমিশন ঘোষণা করা হবে। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৫০০০ টাকা করা হবে। অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত ও শ্রম আইনের গণতান্ত্রিক সংস্কার করা হবে।

৬. দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সব বড় বাজারে কৃষকদের কাছ থেকে পণ্য কিনতে, সরকারি ক্রয় কেন্দ্র খোলা হবে। গ্রাম-শহরের শ্রমিক-কৃষকসহ দুস্থ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আর্মি রেটে-ন্যায্যমূল্যে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা হবে।

৭. শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চিকিৎসাকে বাণিজ্যিক পণ্য করা বন্ধ করা হবে। সকল মানুষকে আধুনিক যুগের উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করার পদক্ষেপ নেয়া হবে। চিকিৎসা ও ওষুধ সুলভ মূল্যে পাওয়া নিশ্চিত করা হবে। সরকারি চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্রাকটিস বন্ধ করা হবে।

৮. নারী ও শিশু নিরাপত্তা বিধানে আইনের কঠোর প্রয়োগসহ রাষ্ট্রীয় আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক সুরক্ষা বিধি-বিধান যথাযথভাবে গ্রহণ করা হবে। নারী-পুরুষ বৈষম্য সকল ক্ষেত্রে দূরীকরণ করা হবে।

৯. পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান, ভূমির অধিকার ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করা হবে। অর্পিত সম্পত্তি আইনের বিলোপ সাধন সাপেক্ষে করণীয় কাজ সম্পন্ন করা হবে। সুন্দরবন ধ্বংসকারী রামপাল প্রকল্প বাতিল করা হবে। তেল, গ্যাস, কয়লাসহ প্রাকৃতিক ও জাতীয় সম্পদের উপর জনগণের শতভাগ মালিকানা নিশ্চিত করা ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স-পেট্রোবাংলার সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হবে।

১০. প্রবাসীদের কাজ, পরিবেশ ও প্রবাসে নিরাপত্তা ও মানবিক সুরক্ষার সকল প্রচেষ্টা নেয়া হবে। দেশে তাদের উপার্জিত আয়ের বিনিয়োগের নিশ্চয়তা থাকবে যাতে তারা দেশে ফিরে স্বচ্ছল মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারেন।

১১. বাড়িভাড়া, চাল, ডাল, গ্যাস, বিদ্যুৎসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম জনগণের আয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে ক্রয় ক্ষমতার আওতায় রাখা হবে। কালো বাজারি ও সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে।

১২. যুদ্ধাপরাধী, স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার আলবদর ও তাদের দলকে নিষিদ্ধ করা হবে। ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার আইন করে বন্ধ করা হবে। ধর্মীয় ও জাতিগত সাম্প্রদায়িক অপশক্তি কঠোরভাবে দমন করা হবে।

দেশবাসীর প্রতি আহ্বান,

আপনারা একবার চুলার আগুনে পোড়া, আবার কড়াইতে ভাজা হওয়া দশা থেকে পরিত্রাণের জন্য দ্বি-দলীয় ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসুন। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা, শোষণ-লুণ্ঠন মুক্ত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র সমাজ ও সুস্থ সংস্কৃতি চেতনা বিকাশে জোট বাধুন। যারাই এ আকাঙ্ক্ষা ধারন করবে তাদের সাথে এবং পাশে দাঁড়ান। অনেক সংগ্রামে বিজয়ী মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ বিনাশ বিকৃতির পথে ধাবিত হতে পারে না। সত্যের পথে জয় আমাদের হবেই।

কীভাবে বিকল্প শক্তি দানা বাঁধবে ও এগুবে

দ্বি-দলীয় বৃত্তের বাইরে মূলত : দুইটি শক্তি, একটি বামপন্থি বিপ্লববাদী অন্যটি উদার গণতন্ত্রী। বামপন্থিরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি হওয়া সত্ত্বেও সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ নয়। আবার উদার গণতন্ত্রপন্থিরাও সকলে এক কাতারভুক্ত নয়। ফলে দ্বি-মেরু কেন্দ্রীক বৃহৎ শক্তি সামর্থকে মোকাবেলা করার জন্য জনগণ এদের কাউকেই এককভাবে বা ক্ষুদ্র জমায়েত শক্তিতে কামিয়াব হতে পারবে মনে করে না। দেশের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করে চলা শাসক শ্রেণির দুই প্রধান বুর্জোয়া দল দেশের সাদা-কালো মিলিয়ে গোটা অর্থনীতির সিংহভাগের দখলদার, বিশাল বিপুল বেকার জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশের জিম্মাদার, প্রচার মাধ্যমের নব্বই শতাংশে নিত্যদিনের দাবিদার, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মদদ এদের কোন-না কোন অংশের প্রতি সর্বদাই ক্রিয়াশীল আর আঞ্চলিকতা-সাম্প্রদায়িকতার মতো হাতিয়ারসমূহ সব সময়ই এদের কাছে মজুত থাকে। কায়েমী স্বার্থবাদীদের বেচা-কেনার হাঁটবাজার এদের জমিতেই বসে। এরা ভালোর চেয়ে আরও ভালোর প্রতিযোগিতায় না গিয়ে খারাপের মাপ পরিমাপে কে কতো আগে পিছে তার বাগবিতণ্ডায় ও মুখ্য বিষয় ছাপিয়ে গৌণ বিষয়ের বাচাল-বিতর্কে জনগণের সংস্কৃতি চেতনাকে উপরে উঠতে দেয়না। কারণ জনগণকে সাংস্কৃতিকভাবে যতো নামানো যায় ততটা উপরে তারা নিশ্চিন্ত আসন গাঁড়তে সক্ষম হয়।

এখন তাহলে উপায় কী? কি করতে হবে — এ নিয়ে নানা মতামত ও মতভেদ রয়েছে। কিন্তু কথা হলো যা চলছে তাই কি চলতে থাকবে কিংবা অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকবে? জনগণ উপায়হীন না হলে এর কোনটাই চায়না। মানুষ পরিবর্তন চায়, অর্থবহ পরিবর্তন। দেশের যে অবস্থা বিদ্যমান তাতে সমাজের আমূল পরিবর্তন তথা রুশ বিপ্লবের শতবর্ষ উদ্‌যাপনকালে এখানে বিপ্লব হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু বিপ্লব পরিচালনার ও সফল করার বিপ্লবী শক্তি ও প্রস্তুতি কি তার ধারে কাছেও আছে? জনগণকে বিশেষ করে শ্রমজীবী জনগণকে তার জন্য সাংগঠনিকভাবে ও চেতনাগত দিক থেকেও কি প্রস্তুত করা হয়েছে? না তারা প্রস্তুত হয়ে আছে? উত্তর হবে, না। এমনকি ১৯০৫ সালের রাশিয়ার ব্যর্থ বিপ্লবেরকালের শক্তি সামর্থও এখন নেই। প্রস্তুতি নেই বলে কি আদর্শ-লক্ষ্য ছেড়ে দিতে হবে? নিশ্চয়ই না। কিন্তু চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে প্রতিটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করে এগুতে না পারলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় আর আদর্শ বাস্তবায়ন দিশা হারিয়ে শুধুই কল্পনাতে স্থায়ী হয়। এখন সকল বামপন্থি শক্তির একতাবদ্ধ হওয়া **প্রথম শর্ত** এবং সাথে সাথে কার্যকর ঐক্যের প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলা ও জনগণের সামনে দৃশ্যমান ও আস্থাভাজন করা **প্রয়োজনীয় শর্ত**। উদারপন্থি শক্তিকে বাদ দিয়ে এ প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ সম্ভব নয়। এরা মার্ক্সবাদী পরিভাষায় মধ্যবিত্ত পেটি বুর্জোয়া সম্প্রদায় শ্রেণি। এরা সারা দেশে পেশাজীবী হিসাবে পরিচিত। আইনজীবী-শিক্ষক-প্রকৌশলী-কৃষিবিদ-চিকিৎসক-সংবাদিক; মাঝারি-ছোট ব্যবসায়ী ইত্যাদি পরিচয়ে সর্বস্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং তারা বিস্তৃত পরিসরে জনমতকে প্রভাবিত করে থাকে। এদের মধ্যে একটা অংশ বিপ্লবী পরিবর্তন মনে প্রাণে কামনা করে; একটা অংশ সমাজতন্ত্রে আগ্রহীও নয়, বিরোধীও নয়। একটা অংশ শাসক দলের কাছে নতজানু ও সুবিধা প্রত্যাশী, অপরাংশ বাধ্যতাবশে ও উপায়হীনতার শিকার হয়ে শাসক শ্রেণির বেষ্টনীতে আটকা পড়ে হাঁস ফাঁস করতে থাকে। বিকল্পের সন্ধান পেলে এদের বড় অংশ বিকল্পের দিকে ঝুঁকবে আর বিকল্প খুঁজে না পেলে শাসক শ্রেণির বড় দুই শিবিরে নিরবে কিংবা সরবে বিভক্ত হয়ে পড়বে। ক্ষুদ্র অংশটি আরও গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন হবে। এদের পছন্দের দল ও ব্যক্তিত্ব হিসাবে তারা উদারপন্থি দল ও নেতৃত্বকেই মনে করে। তবে সবার ক্ষেত্রে সমবিচারে নয়।

জনগণের সকল দাবিতে ও স্বার্থে ক্ষুদ্র হলেও বামপন্থি শক্তি যতোটা প্রতিবাদে প্রতিরোধে বলিষ্ঠ এবং সোচ্চার হয়, রাজপথে যতোটা উপস্থিতি রাখে এবং শাসক দলের কাছ থেকে যতোটা নিপীড়ন-নির্যাতনের মুখোমুখি হয়, উদারপন্থিরা জনগণের স্বার্থ-অধিকার ছুঁয়ে যায়, বিচার-বিশ্লেষণে গভীর দাগ কাটে, এমন কিছু কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে জনমত গঠনেও বেশ ভূমিকা রাখা সত্ত্বেও তেমন দুঃসহ পরিস্থিতি তাদের মোকাবেলা করতে হয় না। কিন্তু স্বৈরতন্ত্র কিংবা ফ্যাসিবাদের থাবা যতো প্রসারিত হতে থাকে ততোই এরা বহুমুখী প্রতিবন্ধকতা ও নিপীড়ন-বঞ্চনার শিকার হন। শান্তিতে থেকে শান্তির বাণী প্রচার অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং অশান্তির আগুনে দগ্ধ হয়ে শান্তির জন্য অশান্ত হতে, আন্দোলিত হতে এবং আন্দোলনে অংশীদার হতে দ্বিধাগ্রস্ত হননা। এখানেই শাসক বড় বুর্জোয়া দলের চেয়েও প্রতিবাদী বামপন্থি শক্তিকে তারা তাদের মিত্র হিসাবে খুঁজে পায় এবং এগিয়ে আসে। আজ সে সময় উপস্থিত। তাতে কি আদর্শিক, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লক্ষ্যের পার্থক্য সব মিলিয়ে যায়? যায় না। তবে এই সময়ের অনেক বড় কর্তব্যের সামনে ভবিষ্যতের বড়ত্বকে টেনে এনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা চলেনা, তাতে পথ যাত্রা থেমে যায়, গন্তব্য চির দূরগামী হয়ে পড়ে। উদারপন্থিদের অনেকের অতীত তো সুখকর নয়, এদের নিয়ে গণআস্থা গড়ে উঠবে কীভাবে? এদের কেউ যে ডিগবাজী দেবেনা তার নিশ্চয়তা কি? এমন প্রশ্নও উঠতে পারে। জনগণের আস্থা কখন কিভাবে তৈরি হবে তার দায়িত্ব জনগণের কাছে রেখে দেওয়াটাই হবে গণতান্ত্রিক কাজ। আর ডিগবাজী যে কেউ যে কোন সময় দিতে পারে। এক্ষেত্রে অনেক বামপন্থিরা কি দায়মুক্ত? আসলে বিষয়টি হলো জনগণের সামনে সবাইকে পরীক্ষায় ফেলা। তাহলে জনগণের সঠিক বেঠিক যাচাইয়ের মান উন্নত হবে আর ডিগবাজি দেওয়াদেরও রাজনৈতিক কপাল পুড়বে। তাতে সাময়িক বিভ্রান্তি যাই ঘটুক সঠিক রাজনৈতিক কর্মপন্থা ও ঐক্যের শক্তি ধরে রাখা গেলে আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি বহুগুণে ঘটে। ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। গণতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী করা না গেলে অগণতান্ত্রিক শক্তি দীর্ঘায়ু হয়। আর জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন যত বেগবান হয়, গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও চর্চা যত সম্প্রসারিত হয় ততটাই বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগ্রাম বিকাশের রাস্তাও প্রশস্ত হয়।

উদারপন্থি কিছু দলের শক্তি সামর্থ তেমন কিছু না থাকলেও তাদের কিছু নেতা আছেন যারা শাসক দলের বিরুদ্ধে হলেও প্রচলিত ব্যবস্থার পক্ষে। ফলে বিত্তবান শ্রেণি, প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন মহল ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্মের সুবাদে ও সুযোগে এদেরকেই সামনে তুলে রাখবে। তাতে কি মূল আন্দোলনের শক্তি পিছিয়ে পড়বে না? এখানেও বিষয়টি গুলিয়ে ফেললে হবেনা। কারণ ঐক্যের নীতিগত অবস্থান রক্ষিত হলে প্রচারের আলোতে কারও মুখ উজ্জ্বল হলে আর কারও মুখ আলোহীনে ঢাকা পড়লেও গোটা আন্দোলন ও আন্দোলনকারী শক্তি তেমন

ক্ষতিগ্রস্ত হয়না। তাছাড়া বামশক্তি উপর উপর প্রচারে ভেসে চলার চেয়েও তার শ্রেণি ভিত্তি নির্মাণে অর্থাৎ শ্রমিক-কৃষক শোষিত মানুষের মধ্যে সংঠন-আন্দোলন গড়ে তুলতে বেশি তৎপর হলে সাময়িক মেঘাচ্ছন্ন আকাশ অচিরেই মেঘমুক্ত হয়ে যাবে। কে কোথায় কতটা জোর দেবে তাও নির্ভর করে মূলত : শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির উপর। আন্দোলনকে অগ্রসর করে নেয়াটাই মূল কথা। কেউ কেউ এমনও ধারনা পোষণ করেন যে, বামপন্থিরা ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়তে চায়। দাড়ি-কমা-সেমিকোলন নিয়ে বিতর্কে সময় নষ্ট করে। আসলে প্রকৃত বামপন্থিরা ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়তে নয় রাস্তা থেকে চলার পথের বাধাগুলো সরাতে চায়। সতর্কভাবে পথ চলতে চায়, যদিও অতি সতর্কতার আড়ালে অনেকে দায় ও ঝুঁকি এড়াতে চায়। মোদ্দা কথা হলো জনগণের স্বার্থ-সমস্যাকে সামনে রেখে জনগণকে সাথে নিয়ে যত বেশি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সম্পৃক্ততা ঘটানো যায় ততো বেশি গণতন্ত্রের পথ খোলাসা হয়। ভোটের আগে জনজীবনের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবো না, আর ভোট আসলে তাতে জনগণ নেমে গেলেও ফিরে তাকাবো না এর কোনটাই কাম্য নয়। যদিও যে বুর্জোয়া শক্তিকে ও নীতিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে তাদের কায়দায়, তাদের নীতিতে চলতে গেলে বিকল্প হবেনা। কারণ এখন নীতি বহাল রেখে শুধু ক্ষমতার বদল বা ভোগদখল নয়, নীতি ও ক্ষমতা দুটোরই বদল সময়ের দাবি। সেক্ষেত্রে একমত হওয়া জরুরি। কেউ বলতে পারেন, বামপন্থিরা প্রতিদিনইতো প্রায় প্রতিটি বিষয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে, কথা বলছে, মার খেয়েছে তাতে লাভ কতটুকু হয়েছে? অন্যদিকে উদারপন্থিদেরও সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও নানা জাতের অনুষ্ঠান হয়েছে, কাগজে খবর বেরিয়েছে, টিভি স্ক্রিনে ছবি দেখা গেছে, তাতেও বা ফল কতটুকু হয়েছে? জনগণতো নামছেনা। সরকারকে সরানো দূরে থাক সামান্য নাড়ানোও তো যাচ্ছে না। তাহলে দল বেঁধে শোরগোল তুলে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে কীলাভ হবে? তার চেয়ে মন্দের ভালো বেছে ক্ষমতাসীনদের অথবা ক্ষমতাপ্রত্যাশীদের যে কারও সাথে হাত মিলিয়ে তাদের সুপথে আনার চেষ্টা অথবা নিজেরা কিছু না করতে পারার চেয়ে কিছুটা করার সুযোগ নিতে দোষ কী? প্রথমত : কোন শাসকের দীর্ঘ সময় টিকে থাকা দিয়ে ন্যায়-অন্যায়ের কিংবা গণতান্ত্রিক শাসনের মানদণ্ড নির্ধারিত হয়না। আর ছোট হোক বড় হোক কোন গণআন্দোলনই রাতারাতি সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছায় না। প্রতিটি ছোট পদক্ষেপ যেমন দূর গন্তব্যকে নিকটবর্তী করে তেমনি ছোট ছোট গণমুখী আন্দোলন গণআকাঙ্ক্ষা পূরণের এক একটি সোপান তৈরি করে চলে। আর স্বৈরতন্ত্র, লুটপাটতন্ত্র, পরিবারতন্ত্রের বুনিয়াদের উপর যারা গভীর শিকড় গেড়ে দাঁড়িয়েছে তাদেরকে সংশোধনের চেষ্টার নজির তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। খারাপের চেয়ে বেশি খারাপ ঠেকানোর প্রকল্প বাস্তবে আত্মপ্রতারণার পাশাপাশি গণপ্রতারণারও সামিল হয়েছে। এসব যুক্তি চিন্তাগত নানামুখী বিভ্রান্তির সাথে সংকীর্ণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হয়ে গেলে তা থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন। কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতা ছাড়তে পারবে না কারণ এটা তাদের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। মধুচক্রের প্রলোভন তো আছেই। তাছাড়া ভোট ছাড়া ক্ষমতা চালিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা, স্বাদ ও দম্ভও তাদের রয়েছে। আর ক্ষমতাপ্রত্যাশীরাও দুই দফা ক্ষমতার বাইরে থাকায় কাহিল দশায় পতিত হয়েছে। আবারও ক্ষমতার বাইরে থাকতে হলে তাদের সাংগঠনিক-রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। ক্ষমতাসীনদের ফুলে ফেঁপে ওঠার রহস্য তো তাদের ভালোই জানা আছে। তাদের ভরসা জনগণের ক্ষোভ, বঞ্চনা ও শাসক দলের দুর্নীতি-দুঃশাসনের অবসান কামনাজাত নেতিবাচক অর্জন। তাছাড়া দশ বছর আগের স্মৃতিও এখন অনেকটা মলিন। সবকিছু মিলে সুষ্ঠু ভোট তো নয়ই এমনকি সংঘাতমুক্ত ভোটও হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে চরম ফ্যাসিবাদ, কিংবা গৃহযুদ্ধ কিংবা সামরিক হস্তক্ষেপ এর বাইরে তো কিছু দেখা যাচ্ছে না। সেটাই যদি বাস্তব হয় এবং সেদিকেই যদি রাজনীতির গতিমুখ দেখা যায় তাহলেও তো বামগণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায় একটি বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলে গণশক্তিতে দেশের এই সংকট থেকে মোড় ফেরানোর চেষ্টা করা। তা না করলে এটা রাজনৈতিক অপরাধের পর্যায়ে গণ্য হতে পারে।

লক্ষ্য পূরণে ঐক্য সাধন ও বাস্তবায়ন কীভাবে?

আছে বস্তু নিয়ে বিচার করতে হবে এবং পরিবর্তনের স্বার্থে বিদ্যমান বাস্তবতাকে হিসাবে রেখে এগুতে হবে। বামপন্থি এবং উদারপন্থিদের মধ্যে একটা ছোট সংক্ষিপ্ত বক্তব্য সর্বোচ্চ বোঝা-পড়ার ভিত্তিতে ও সর্বনিম্ন কর্মসূচিতে ঐক্যমত পোষণ করতে হবে। প্রাথমিক ধাপে বামপন্থি সকল শক্তি একটি সমঝোতা কেন্দ্রে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং উদারপন্থি শক্তিগুলিও যথারীতি পৃথক একটা বলয় তৈরি করবে। ঐক্যমত্যের বিষয় নিয়ে যার যার অবস্থান থেকে জনসম্মুখে দৃশ্যমানতা দেখাতে হবে এবং সব কণ্ঠে এক সুর তুলতে হবে। এতে একটা ঐক্যের বার্তা পৌঁছে যাবে। উদারপন্থি কিংবা বামপন্থি যে কারো কর্মসূচিতে বা অনুষ্ঠানে অন্যরাও সংহতি জানিয়ে অংশ নিতে পারে। প্রথমে মানুষ হয়তো ভাববে এবং বলবে একই যদি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয় তাহলে এরা এক জায়গায় এক মঞ্চে দাঁড়াচ্ছেনা কেন? এটা অনেকটা দুই নেত্রীকে এক জায়গায় পাশাপাশি আসনে বসানোর আবদারের মতো হয়ে যেতে পারে। সামরিক বাহিনী তাদের বসিয়েছিল, কারাবাসে পাঠিয়েও একই অবস্থায় রেখেছিল, ফল হয়নি। যদিও এখানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্রের ও আদলের। ফলে বামপন্থি ও উদারপন্থিদের এমনকি বামপন্থিদের ভিতরকার এবং উদারপন্থিদের ভিতরকারও অনেক পার্থক্য দ্বন্দ্ব রয়েছে। তা সত্ত্বেও গণতন্ত্রের স্বার্থে, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল শক্তি জনগণের মধ্য থেকে, ভিতর থেকে, সাথে থেকে মাঠের আন্দোলন কর্মসূচিতে, বক্তব্য বিবৃতিতে আস্থার সনদ নিয়ে বেরিয়ে এসে আন্দোলনের বিকাশের পরিণত পর্যায়ে কিংবা আন্দোলন চলতে চলতে নির্বাচন ঘোষিত হলে এবং পরিবেশ তৈরি হলে সমঝোতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে এক অবস্থানের ছবি তুলে ধরতে পারে। তাতে সময় পার হয়ে যাবেনা? ঐক্যের বার্তা শুরু থেকে দিতে পারলে অবস্থানের সাময়িক দূরত্বে তা আটকাবেনা। বহু আগে থেকেই এক ছায়াতলে বিশ্রাম নেয়ার চেয়ে চলতে চলতে মিলিত শক্তির ঐক্য জালে বিশাল জনগোষ্ঠীর সমবেত বজ্র নির্ঘোষে ঝড় তুলতে পারলে অনেক বেশি কাজ হবে।

কীভাবে সমতাল রচিত হবে?

ঐক্যমতের ভিত্তিতে রচিত বক্তব্য ও কর্মসূচি বা দাবিনামা একই দিনে সকলে যার যার অবস্থান থেকে মিডিয়ায়, জনসমক্ষে প্রচারের উদ্দেশ্যে পাঠাতে পারেন। একই বক্তব্য প্রচারে নিতে ও জনপ্রিয় করতে দুই অবস্থান থেকে প্রচারপত্র সারা দেশে বিলি বণ্টনের ব্যবস্থাও

করতে হবে। জনগণের জ্বলন্ত ও নিত্য সমস্যাকেন্দ্রিক ইস্যু নিয়ে একই দিনে যার যার মতো করে আন্দোলন কর্মসূচিতে দাঁড়াতে হবে। কেউ হয়তো রাজপথে, কেউ আলোচনা সভা কিংবা মতবিনিময় সভা ইত্যাদিতে। এইভাবে জনগণের সামনে প্রত্যেকেই নিজনিজ অবস্থান থেকে অঙ্গিকারাবদ্ধ ও দায়বদ্ধ হবেন। জনমতের ইচ্ছা, চাপ ও অংশগ্রহণ যতো বাড়তে থাকবে ততো ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের ঘনিষ্ঠতাও বাড়তে থাকবে। এখনও যারা নানা দ্বিধা দ্বন্দ্ব নিয়ে চলছেন আন্দোলিত হয়ে চলার পথে তারও মাত্রা কমে আসবে। কারণ জনগণই তো প্রকৃত শিক্ষক, বিচারক ও শেষ ভরসা। রাজনৈতিক দলসমূহের জোটবদ্ধ অবস্থানের পাশাপাশি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারনাপুষ্ট বুদ্ধিজীবী পেশাজীবিরাও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কিংবা মিলিত অবস্থানে এগিয়ে এসে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা জনগণের কাছে তুলে ধরতে পারেন এবং ওজন বাড়াতে পারেন। জোটবদ্ধ অবস্থানের পক্ষে মতামত ও যুক্তি রাখতে পারেন। সাংস্কৃতিক সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গরাও তাদের সৃজনশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গণআকর্ষণ তৈরি করতে পারেন। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, নারী সংগঠনসমূহ ও ব্যক্তিত্বরাও এগিয়ে এসে স্ব স্ব ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারেন। এমন পরিস্থিতিতে জোট-মহাজোটের দ্বি-দলীয় রাজনীতির প্রভাবাধীন বহু মানুষ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন। অংশও নিতে পারেন। সবকিছু মিলে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় যদি নির্বাচনের স্রোতে জনগণ সামিল হয়ে যায় তখন এক প্লাটফর্ম কিংবা নির্বাচনী সমঝোতা ভিত্তিক ঐক্যঅভিযান পরিচালিত করা যাবে।

এখন থেকে কাজ আরম্ভ করা প্রয়োজন :

যে কোন ঐক্য বা সমঝোতা প্রক্রিয়ার একটি সাংগঠনিক রূপ ও কার্যপরিচালনা বিধি দরকার হয়। দলের কাঠামো আর কর্মপদ্ধতি যেমন একরম হয়না, তেমনি ঐক্য বা সমঝোতার কাঠামোগত বিন্যাস বা কর্মপদ্ধতিও স্থানে কালে সময়ে পার্থক্যসহ এক প্রকার হয়না। ১৯৫৪'র যুক্তফ্রন্ট, ১৯৬৯ এর ৬ দফা ও ১১ দফা সমঝোতা কাঠামো; ১৯৯০ এর ১৫ দল ও ৭ দল থেকে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট; ১৯৯৪'র বামফ্রন্ট, ১৯৯৯'র ১১ দল ইত্যাদি জোট বা সমঝোতা ঐক্যের মাঝেও পার্থক্য ও অন্তর্গত অনেক মিল লক্ষ করা যায়। এখন সিপিবি-বাসদ মিলে একটি বাম জোট রয়েছে। বাম মোর্চা নামে আরেকটি বাম জোট এর সাথে একসঙ্গে কাজ করার একটা সমঝোতা হতে চলেছে। এর বাইরে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল, জাতীয় গণফ্রন্টসহ চারটি বামপন্থি দলের আরেকটি জোট রয়েছে, তাদের সাথেও আলোচনা হচ্ছে। উদারপন্থিদের মধ্যে গণফোরাম, নাগরিক ঐক্য ও জেএসডির একটা সমঝোতা আছে। বিকল্প ধারা ও কৃষক শ্রমিক জনতা লীগসহ আরও দু'একটি দলের সাথে তাদের যোগাযোগ রয়েছে। এখন এই দুটি অবস্থানের নিজস্ব সংহতি মজবুত করা ও সার্বিক বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছানো জটিল হলেও জরুরি। এমনিতেই আওয়ামী জোট, বিএনপি জোট ও তাদের আন্তর্জাতিক সহযোগিরা তাদের মতো করে তৎপরতায় এগিয়ে রয়েছে। গঠনমূলক প্রস্তুতিকাজ দ্রুত হাতে নিতে পারলে বয়ে যাওয়া সময়কে বহমান গতিময়তা দেয়া যাবে। অন্যথায় সময়ের কাজ অসময়ে করতে গেলে কার্য সাধন হবেনা।

বাম জোট ও উদারপন্থি জোটের নিজস্ব সমন্বয় ব্যবস্থার বাইরে উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের একটা জায়গা করতে হবে। প্রতিটি জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে একযোগে কাজ করতে হলে তা লাগবে। এখন ব্যক্তিত্বের সংঘাত এড়াতে প্রধান নেতাদের বাইরে দ্বিতীয় সারির কোন একজন নেতা যিনি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবেন তাঁকে সমন্বয়কারী কিংবা দুইজনকে যুগ্ম সমন্বয়কারী করা যেতে পারে। বাম জোট ও উদারপন্থি জোটের নিজস্ব সমন্বয় ব্যবস্থার বাইরে সমন্বয়ের স্বার্থে এটা জরুরি। নির্বাচন প্রশ্নে এখনই নেমে পড়ার বিষয় না থাকলেও প্রত্যেক দলের প্রার্থী নির্বাচনসহ অন্যান্য প্রস্তুতিও শুরু করা দরকার। সকল দল মিলে কার্যকর অর্থে তিনশ আসন পূরণ করতে হলে বাস্তবে দলের বাইরে সৎ, জনগণের কাছে আস্থাভাজন ব্যক্তিদের তালিকাভুক্ত করার কাজে হাত দিতে হবে। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা একটা কার্যকর ঐক্যের শক্তি দেখাতে না পারলে এ ব্যাপারে ভাল সাড়া পাওয়ার সম্ভব না। ভিন্ন পরিস্থিতিতে সাড়া জাগলে নির্বাচন নিকটবর্তী সময়ে এ উদ্যোগ যথেষ্ট গুরুত্ব পেতে পারে। জনগণ এখন দেখতে চাইবে কোন কোন শক্তি জনগণের স্বার্থে ও দাবিতে সোচ্চার ও আন্তরিক। হঠাৎ কোন ঘোষণায় পরিস্থিতি মাতিয়ে তোলার বদলে ধাপে ধাপে ধারাবাহিকভাবে অগ্রসর হতে পারলে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে।

একটা যৌথ অর্থ তহবিল ও আচরণ বিধিও প্রয়োজন

প্রত্যেক দলের নিজস্ব খরচের বাইরে জোটবদ্ধ কর্মকাণ্ডের জন্য অর্থ তহবিল প্রয়োজন। এ অর্থ জনগণের কাছ থেকে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারণ অর্থবানদের টাকা নির্ভর রাজনীতিতে জনগণের ক্ষমতায়ন হয়না। তবে বৃহত্তর জনস্বার্থে কিছু মানুষ অবশ্যই পাওয়া যাবে যারাও নিঃস্বার্থভাবে অর্থ চাঁদা দেবেন, সময়ের গুরুত্ব ও জাতীয় স্বার্থে বড় কাজ ভেবে। একটি যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন ও প্রয়োজন সাপেক্ষে নানা পরিকল্পনাও নেয়া যাবে। সব সময়েই মনে রাখতে হবে জোট-মহাজোটের এই দুই পাহাড় অতিক্রম করার কাজটি কঠিন তবে অসম্ভব নয়। গভীর সংকল্প, স্বার্থ ত্যাগের মনোভাব ও দুঃসাহস লাগবে। জনগণের শক্তিই সবচেয়ে বড় শক্তি। এ শক্তির প্রতি ভরসা রেখে এগুতে পারলে ভিতরে বাইরে যত বাঁধা আসুক মোকাবেলা করে জয়ের পথ রচিত হবে।